

নসি়

তারাপদ রায়
(ছোটগল্প)

নসি় শব্দটা স্ত্রীলিঙ্গ, নস্য থেকে নসি়। নস্য পুংলিঙ্গ, তাই থেকে স্ত্রীলিঙ্গে নসি়। যেমন নদ ও নদী।

ছোট বয়েসে আমরা যা কিছু শিখি বা জানি তার সব কিছু ঠিক নয়। হয়তো নস্য-নসি়, পুংলিঙ্গ-স্ত্রীলিঙ্গের এই ব্যাপারটাও ভুল শিখেছিলাম।

যিনি ভুল শিখিয়েছিলেন সেই সরসীপিসির ওপরে কিন্তু আমাদের আস্থা ছিল খুব। শুধু আমাদের কথাই নয় আমাদের ছোট শহরটার সবাই সরসীদিকে এক নামে চিনত, তখনকার সতেরো-আঠারো বছর বয়েসি শ্যামলা, একহারা চেহারার মেয়েটিকে সবাই মান্য করত।

মান্য করার কারণও যথেষ্ট ছিল।

হিসেবমতো আমার ম্যাট্রিক পরীক্ষার বছর সেটা।

ম্যাট্রিক?

প্রৌঢ় পাঠক, প্রৌঢ়া পাঠিকা তোমাদের কি এখনও মনে আছে ম্যাট্রিক? স্মৃতি-বিদ্যালয়ের দোরগোড়ায় ম্যাট্রিক শব্দটা হঠাৎ ঘণ্টার মতো বেজে উঠল।

আমি ছিলাম শেষবারের ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী। তারপর ম্যাট্রিক উঠে গিয়ে এল স্কুল ফাঁইনাল। সে স্কুল ফাঁইনালও কবে উঠে গেছে, এল সেকেন্ডারি, আমার ছেলেকে সেকেন্ডারি পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। সব চেয়ে বেশি দিন চার দশকেরও বেশি কাল ধরে চলেছিল ম্যাট্রিক। আমি আমার বাপ কাকা সবাই ম্যাট্রিক দিয়েছিলাম। তার আগে এন্ট্রান্স চলেছিল সেই ইংরেজি শিক্ষার গোড়া থেকে, আমার জ্যাঠামশায়, ঠাকুরদা, ঠাকুরদার বাবা সবাই ছিলেন এন্ট্রান্স পাশ। এই ধারাবাহিকতা চলেছিল এই শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত। মধ্যে তো উঠেই গিয়েছিল প্রায় দশ ক্লাসের এই শেষ পরীক্ষাটা, চালু হয়েছিল এগারো ক্লাসের শেষ পরীক্ষা।

এন্ট্রান্স, তারও পরে ম্যাট্রিকের যে মর্যাদা ছিল এখন বোধহয় বেঁচে নেই। আমাদের বাসায় সেকালের এন্ট্রান্স ফেল মুহুরিবাবু গর্ব করে বলতেন, একটা এন্ট্রান্স ফেল দশটা ম্যাট্রিক পাশের সমান।

এতকাল পরে এন্ট্রান্স পাশ লোক আর একজনও বোধহয় বেঁচে নেই। আমার ক্ষমতা বা সম্বল থাকলে এই এন্ট্রান্স প্রজাতি নিশ্চিহ্ন হওয়ার আগে শেষ মানুষটিকে খুঁজে বার করে সম্বর্ধনা দিতাম। তবে আমার মতোই ম্যাট্রিক পাশ লোকেরা এখনও আছেন, পঞ্চাশের খারাপ দিকে, ষাটের কোঠায়, সত্তরের আশির হয়তো বা নব্বইয়ের কোঠায়।

একটা সাধারণ গল্পে প্রবেশিকা পরীক্ষা নিয়ে এতখানি আদিখ্যেতা না করলেও চলত। কিন্তু গল্পটা যে আমার নিজের ম্যাট্রিক পরীক্ষা সংক্রান্ত। তা ছাড়া ইতিহাসটা একটু ঝালিয়ে নেওয়া, আজেবাজে গালগল্পের চেয়ে নিশ্চয় খারাপ নয়।

সে যা হোক, সরসীপিসির কথায় ফিরি। আমাদের ঠিক দুবছর আগে সরসীপিসি ম্যাট্রিক পাশ করেছিলেন ফার্স্ট ডিভিশনে, সংস্কৃতে আর ভূগোলে লেটার পেয়ে। ভূগোল তখন ছিল পঞ্চাশ নম্বরের হাফ পেপার, তার মধ্যে চল্লিশের বেশি পাওয়া সোজা কথা নয়। তা ছাড়া সংস্কৃতে লেটার পাওয়াও রীতিমতো অসম্ভব ব্যাপার, সেকালের পণ্ডিতমশায়েরা সংস্কৃত খাতা খুব কড়া করে দেখতেন, সামান্য

অনুস্বর বিসর্গ একচুল এদিক ওদিক হলে আর রক্ষা নেই। কত ছাত্র সংস্কৃতে ফেল করে ম্যাট্রিক পাশ করতে পারত না তার ইয়ত্তা নেই। তা ছাড়া সংস্কৃত তখন আবশ্যিক বিষয় ছিল, হিন্দু ছেলেদের সংস্কৃত আর মুসলমান ছেলেদের আরবি বা ফারসি বাধ্যতামূলক ছিল। কারণ এগুলো ধর্মভাষা। যেমন ইংরেজি ছিল রাজভাষা, বাংলা মাতৃভাষা।

ধর্মভাষা পড়ানোর জন্যে সব স্কুলেই কয়েকজন পণ্ডিত ও মৌলভি থাকতেন। পদমর্যাদা অনুসারে হেডপণ্ডিত, ফার্স্ট পণ্ডিত, সেকেন্ড পণ্ডিত, ফার্স্ট মৌলভি, সেকেন্ড মৌলভি ইত্যাদি বলা হত। তবে সম্বোধন করা হত পণ্ডিতমশায় কিংবা মৌলবি সাহেব।

আমার দাদা পড়ত আমার থেকে এক ক্লাস ওপরে আর সরসীপিসির এক ক্লাস নীচে। দাদা এইট থেকে নাইনে উঠতে সব বিষয়ে পাশ করেছিল, তবু সংস্কৃতে চোদ্দো পেয়ে সেকেন্ড কলে প্রমোশন পেল।

দাদার সংস্কৃতে ভয় ধরে গিয়েছিল। দাদা বাসায় কাউকে কিছু না বলে নাইনে ওঠার পর ভাঁড়ার ঘর থেকে চুরি করে এক বোতল কাসুন্দি আর এক বয়াম আমের আচার দিয়ে হেড মৌলভি সাহেবকে বশ করে। তিনি রাজি হয়ে যান দাদাকে আরবি ক্লাসে নিতে। সে সময় দেখেছি দাদা লুকিয়ে আলিফ-বে-পে-তে-সে, এই সব কী যেন বিড়বিড় করত চোখ গোল গোল করে, পরে জেনেছিলাম সেগুলো আরবি বর্ণমালা। কিন্তু দাদার সে সাধ পূর্ণ হয়নি, হেডমাস্টার মহোদয় সৎ ব্রাহ্মণের ছেলেকে আরবি নিয়ে পড়তে অনুমতি দেননি, কী যেন বিধিগত কুট বাধা ছিল কোথায়।

এ খবর বাসায় পৌঁছালে একটু সোরগোল হয়েছিল। তবে দাদার ব্যাপার-স্যাপার ছিল আলাদা। দাদাকে কোনও বিষয়েই কেউ বিশেষ ঘাঁটাত না। শুধু ঠাকুমা তাকে বলেছিলেন, পশ্চিমবাড়ির সরসী তো খুব ভাল সংস্কৃত জানে, তুই তার কাছে শিখে নে।

দাদা গর্জে উঠেছিল, সরসী তো শত্রুপক্ষের মেয়ে। তোমার গতবারের কথা মনে নেই। ওর কাছে। কী শিখব, ও ইচ্ছে করে ভুল শেখাবে।

দাদা এই কথাগুলো যখন বারান্দায় দাঁড়িয়ে ঠাকুমাকে চঁচিয়ে চঁচিয়ে বলছিল, সরসীপিসি তখন।

ওঁদের বাড়ির জানলার পাশে টেবিলের সামনে এসে খাতায় কী যেন লিখছিলেন, দাদার কথা শুনে

একবার মুখ তুলে জানলা দিয়ে দেখে ফিক করে হেসে আবার লেখায় মনোনিবেশ করলেন।

আমি বারান্দায় দাদার পাশেই ছিলাম। দাদার সদ্য ব্যবহৃত শত্রুপক্ষের মেয়ে কথাটি আমার চেনা।

কয়েকদিন আগেই এই নামে একটা নতুন বই এসেছে আহমদিয়া লাইব্রেরির শো কেসে, ইস্কুল

যাওয়ার। পথে দাদা আর আমি দুজনেই সেটা দেখেছি। ঢাকা বা কলকাতা থেকে নতুন কোনও বই

এলে প্রথম কিছুদিন সেগুলো কাঁচের শো কেসে রাখা হত। খালধারের বইয়ের দোকানগুলোর পাশ

দিয়ে ইস্কুলে যাতায়াতের পথে আমরা সেগুলো খুঁটিয়ে দেখতাম।

এখনও সরসীপিসির কথাই শুরু হল না। শত্রুপক্ষের ব্যাপারটা যথা সময়ে বলা যাবে।

সরসীপিসি যেবার ম্যাট্রিক পাশ করলেন সে বছর আমাদের শহরের মাত্র পাঁচজন ম্যাট্রিকে ফাস্ট

ডিভিশন পেয়েছিল, তার মধ্যে সরসীপিসি একা মেয়ে। শুধু তাই নয় আমাদের শহরে অনেক কালের

মধ্যে মাত্র দুটি মেয়ে ফাস্ট ডিভিশন পেয়েছিল, তার একজন ওই সরসীপিসি আর অন্যজন

সরসীপিসিরই দিদি অতসীপিসি। ম্যাট্রিক পাশ করার পর পর আমাদের তখন খুব অল্প বয়েস,

অতসীপিসির বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। এখনও একটু একটু মনে পড়ে বিয়ের বাসর-ঘরে অতসীপিসির বর

হেঁড়ে গলায় এখনি উঠিবে চাঁদ আধো আলো আধো ছায়াতে গেয়েছিলেন।

এসব অনেককাল আগেকার কথা। এত বছর পরে অত অল্প বয়েসের কোনও কিছু মনে থাকার কথা

নয়। কিন্তু কেমন যেন মনে পড়ে সেদিন খুব ঘন জ্যোৎস্না উঠেছিল। বাসরঘরের সামনের উঠোনে

এক ঝক কাঠচাপা গাছের ফুল-পাতা মাখামাখি হয়ে গিয়েছিল চাঁদের আর হাঁজাকের আলোয়।

অতসীপিসিয়ার বাসরঘর হয়েছিল আমাদের দালানের সবচেয়ে বড় ঘরটায়, যে ঘরটায় আত্মীয়স্বজন

এলে থাকতেন। তখন আমাদের ওখানে এরকমই হত। পাড়ায় একটা বিয়ে-পৈতে-অন্নপ্রাশন হলে

ব্যাপার হত আশেপাশের বেশ কয়েকটা বাড়ি মিলে। বিয়েটা হত নিজের বাড়িতে, বরযাত্রীরা উঠত অন্য এক বাড়িতে, বাসরঘর হয়তো আরেক বাড়িতে যেখানে ভাল খালি ঘর আছে।

আমাদের পাশাপাশি বাড়ি। সরসীপিসিদের বাড়ির চলতি নাম ছিল পশ্চিমবাড়ি। লাগোয়া পাশের বাড়ি আমাদের সেই অর্থে বাড়ির পরিচয় হওয়া উচিত পূর্বাড়ি নামে, কিন্তু কোনও অজ্ঞাত কারণে আমাদের বাড়ি হল দক্ষিণবাড়ি। এবং ততোধিক অজ্ঞাততর কারণে পূর্ববাড়ি নামে কোনও বাড়ি ছিল না। এমনকী উত্তরবাড়িও ছিল না।

এই নিয়ে কারও মনে কখনও কোনও সংশয় দেখা গিয়েছে বলে শুনিনি। আরও অনেক কিছু মতোই এসব আমরা জন্মতক মেনে নিয়েছিলাম। বোধহয় শহর যখন নতুন পত্তন হয় সেই সময় সীমানা নির্দেশক এই সব নামকরণ হয়েছিল। আর নামাঙ্কিত বাড়িগুলোও স্থান বদল করেছিল। আমাদের বাড়িইনাকি আগে ছিল নদীর পাশে, বারবার ভাঙনের মুখে শহরের এপাশে উঠে এসেছিল। স্থানবদল, দিকবদল হয়েছিল কিন্তু বাড়ির নামবদল হয়নি।

পুরনো দিনের কথা লিখতে গিয়ে কী যে সব অবান্তর কথা চলে এল। স্মৃতিঠাকুরানির ঝুলিতে কী যে অবান্তর আর কী যে অবান্তর নয় আমি হেন সামান্য রচনাকার সেটা কিছুতেই ধরতে পারি না।

বরং সরসীপিসির কথা যেটুকু এখনও মনে আছে, শেষবার ভুলে যাওয়ার আগে সেটা লিখে রাখি। সরসীপিসির দেখতে সুন্দরী ছিলেন না। শ্যামলা, ছিপছিপে বাঙাল মফস্সল শহরের ফ্যাশনহীন অনাধুনিকা। একটু আধুনিকতা অবশ্য ছিল, সেটা হল পুরনো বাংলা ধরনে শাড়ি না পরে ড্রেস করে মানে আজকালকার মতো কুচিয়ে শাড়ি পরা।

সুন্দরী না হলেও বুদ্ধিমতী ছিলেন সরসীপিসি। বুদ্ধি ও মেধা তার যথেষ্টই ছিল। তাঁর চোখেমুখে বুদ্ধির একটা আভা খেলে যেত। তবে তার সবটাই সুবুদ্ধি নয়। কিছুটা দুষ্টবুদ্ধিও ছিল।

না হলে, শুধু শুধু আমাকে কেন শিখিয়েছিলেন লিঙ্গ পরিবর্তন করে নদ যেমন নদী হয়, বালক যেমন বালিকা হয়, সিংহ হয় সিংহী, তেমনই নস্য হয়ে নস্যি।

এই গল্পের নাম নস্যি। সেই জন্যেই বোধহয় নস্যির প্রসঙ্গটা স্বাভাবিক ভাবেই এসে গেল।

আমাদের সেই বাল্যকাল, সেটা ছিল নস্য বা নস্যির সুবর্ণযুগ। নস্যির দোকান যত্রতত্র, যেকোনও দোকানে নস্যি।

নস্যিই বা কতরকম। র, পরিমল, রোজ। তার কত রকম গন্ধ। র নস্যির কড়া ঘ্রাণ, রোজের গোলাপি সৌরভ, পরিমলে মধুর সুবাস।

উকিল-ডাক্তার, মাস্টার-ছাত্র, মুহুরি-মক্কেল, বি-চাকর সবাই নস্যি নিত। তখন নাকি বাকিংহাম প্যালেসে রাজবাড়ির ডিনার শেষে নস্যি পরিবেশন করা হত ব্রাভির বা লিকারের পাশাপাশি সোনার নস্যদানিতে।

নস্যদানিও যে কত রকম ছিল। টিনের, পিতলের, রূপোর, পাথরের, হাতির দাঁতের। তার আবার কত কারুকার্য। অধিকাংশ নস্যির নেশার লোকের পকেটে দুটো করে রুমাল একটা ময়লা, মোটা কাপড়ের নস্যির রঙে চিত্র-বিচিত্র, অন্যটি শৌখিন সাধারণ ব্যবহারের রুমাল। বাড়ির কাজের লোক সেসব ঘৃণিত নস্য কলঙ্কিত রুমাল কাঁচতে চাইত না, গিন্নিরা নিজেদের চানের সময় বাঁ হাতে আলগোছে ধরে নাক সিঁটকিয়ে কর্তব্য পালন করতেন ওই রুমাল কেচে।

নস্যি নিত না কে? হেডমাস্টার মশাইয়ের টেবিলে নস্যির আস্তুর পড়ে থাকত। হেডমাস্টারমশাই যখন ঘরে থাকতেন না বুড়ো দপ্তরি চকমোছার ডাস্টার দিয়ে সেগুলো জড়ো করে নিজের টিনের কৌটোয় ভরে নিত।

জজসাহেব নস্যি নিতে নিতে সওয়াল শুনতেন। উকিলবাবু প্রকাশ্য আদালতেই নস্যি টেনে সওয়াল করতেন, তাতে আদালত অবমাননা হত না। আসামি কয়েদখানায় ঢোকান মুখে শেষ টিপ নস্যিটা নাকে

দিয়ে নিত, তাকে গারদে ঢোকানোর আগে জমাদারসাহেব তার পকেট তল্লাসি করে তার নস্যির কৌটো বাজেয়াপ্ত করতেন।

বেকার যুবক, খদ্দেরের নস্যিরঙা পাঞ্জাবি পরা বিপ্লবী নেতা, বাজারের দোকানদার, দারোয়ান, কোচম্যান প্রত্যেকের পকেটে বা কোমরের খুঁটে একটা করে নস্যির কৌটো। একদিন ইস্কুলে যাওয়ার মুখে ইদারার ধারে দাদার কাঁচতে দেওয়া ছাড়া জামার পকেট থেকে বেরোল এক নস্যির কৌটো। আমাদের বাড়ির পুরনো লোক সৌদামিনী দাসী সেই নস্যির কৌটো হাতে পাকৃতি ময়লা কাপড়ের বোঝা এক লাফে পেরিয়ে ইদারার ধার থেকে এসে পড়ল একেবারে বাড়ির মধ্যের উঠানের মাঝখানে, সেখানে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে কপাল চাপড়াতে লাগল আর চৈঁচাতে লাগল, ওগো, আমাদের কী সর্বনাশ হল গো! বড় খোকন না একেবারে গোল্লায় গেল গো!

বড় খোকন মানে আমার দাদা। আমি আর দাদা দুজনেই খোকন, দাদা বড় খোকন আর আমি ছোট। খোকন।

সৌদামিনীর এই আতঁ বিলাপে, প্রাণাধিক কিশোর পৌত্রের পদস্বলনে যাঁর সবচেয়ে বেশি বিচলিত হওয়ার কথা ছিল সেই আমার পিতামহী তাড়াতাড়ি পুজোর ঘরের মধ্যে ঢুকে পিতলের লক্ষ্মীমূর্তির নীচে থেকে তার রূপোর নস্যির কৌটো বের করে তার থেকে এক টিপ নস্যি নিয়ে নাকে দিয়ে দ্রুত মালা জপতে লাগলেন। তখন ভাবতাম ঠাকুমা নস্যি পায় কোথায়, কে এনে দেয়। এতদিন পরে এখন মনে হয় ঠাকুরদাই লুকিয়ে এনে দিতেন ওই নেশার দ্রব্যটি প্রিয় সহধর্মিণীকে।

সেইদিন সন্ধ্যায় দাদার এই অধঃপতন নিয়ে বাড়িতে খুব সোরগোল হল। সেদিনই সকালবেলা ঠাকুরদার কাছে তার মক্কেল এসেছিল যারা ডাকাতি করে ধরা পড়েছে, এখন জামিন আছে, ধরা পড়ার সময় তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে একটা করে গুপ্তি আর একটা করে নস্যির কৌটো পাওয়া

গেছে—ঠাকুরদার এন্ট্রান্স ফেল মুহুরিবারু জানানেন। ছোট ছেলের পকেট থেকে নস্যির কৌটো বেরোনোর গুরুত্ব বোঝাতে তিনি এই খবরটা দিলেন।

দাদা কিন্তু নির্বিকার। বাড়ির নীচের বারান্দায় জটলা চলছিল। আমি আর দাদা ছাদের এক প্রান্তে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ছাদ ঘেঁষে কয়েকটা পুরনো আমগাছ, বৈশাখের শুরু, কয়েকদিন আগে নববর্ষ গেছে। আমার মুকুল ঝরে গিয়ে সদ্য গুটি ধরেছে। আবছা অন্ধকারে থোকা থোকা আম ছবিতে দেখা আঙুরগুচ্ছের মতো দেখাচ্ছে। দুয়েকদিন আগে ঝড়বৃষ্টি হয়ে গেছে, কালবোশেখি। আকাশে আজকেও মেঘ উঠেছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। আমাদের দালানের পিছনে পুকুরপারে ব্যাঙ ডাকছে, সঙ্গে তাল মিলিয়ে কাছে দূরে ঝাঁঝি ডাকছে। খালের ধারে সিনেমাহল থেকে মানেনা-মানা সিনেমার ডায়ালগ ভেসে আসছে বাতাসে। সিনেমাটা দেখা থাকলে বেশ বোঝা যায় কোন জায়গাটা চলছে।

নীচের তলার কোলাহল স্তিমিত হয়ে এসেছে। দাদার বিচারসভা সাজ হয়েছে, দাদার ভবিষ্যৎ যে অন্ধকার এ বিষয়ে প্রায় সবাই একমত হয়ে যে যার কাজে চলে গেছে।

অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর হঠাৎ পরম দার্শনিকের মতো দাদা আমাকে বলল, খোকন কথাটা নস্য না নস্যি?

আমরা বাঙাল দেশের লোক। আমাদের কথাবার্তায় সাধুভাষার দিকে ঝাঁক বেশি। আমরা কলিকাতা বলি, লবণ বলি, আমরা নস্যি বলি বটে তবে অনেকে নস্যও বলতেন।

সবাই বলে আমি অল্প বয়েস থেকেই একটু বেশি পাকা। তাই বোধহয় দাদার প্রশ্নের জবাবে বলেছিলাম, নস্যনস্যি দুই-ই হয়।

দাদা আমার কথায় গুরুত্ব দিল না, তার বদলে বলল, সরসীর কাছ থেকে একবার জেনে নিস তো। এ বছরের ঝগড়া লাগার আগেই জেনে নিস।

সরসীপিসিদের পশ্চিমবাড়ি আর আমাদের দক্ষিণবাড়ির মধ্যে একটা বছরকার ঝগড়া ছিল, প্রতি বছরেই ঝগড়াটা হত, ঝগড়াটা চলত পুরো গ্রীষ্মকাল জুড়ে। তারপর আষাঢ়ের শেষে কিংবা শ্রাবণের গোড়ায় যখন যমুনা নদীর বেনোজল শহরের মধ্যের খাল ভাসিয়ে, রাস্তা ডুবিয়ে আমাদের উঠোনের। মধ্যে ঢুকে যেত, তখন এই দুটো বাড়ি খুব কাছাকাছি চলে আসত, বিনা মীমাংসায় এক বছরের মতো বিবাদ মূলতুবি থাকত। একই ডিঙি নৌকোয় সরসীপিসিরা আর আমরা স্কুলে যেতাম, যতদিন না স্কুলের ক্লাসঘরে জল ঢুকে স্কুল বন্ধ হয়ে যেত। মক্কেলের ঢাকাই নৌকোয় করে আর সকলের সঙ্গে আদালতে যাওয়ার পথে সরসীপিসিমার বাবাকে ঠাকুরদা তার সেরেস্তায় নামিয়ে দিতেন।

ইতিহাসটা সংক্ষিপ্ত করে বলি। দুটো পাশাপাশি বাসা। মধ্যে একটা নড়বড়ে টিনের বেড়া রয়েছে। বেড়ার শেষ মাথায় একদম সীমান্ত একটা আমগাছ। খুব পুরনো বুড়ো আমগাছ।

এই গাছটা নিয়েই যত বিপত্তি। গাছটার দুটো নাম। আমাদের দক্ষিণবাড়িতে এই গাছটাকে বলা হত লালবাগের আমগাছ।

কবে সেই সম্রাট পঞ্চম জর্জ নাকি মহারানি ভিক্টোরিয়ার আমলে ঠাকুরদার দাদা তার ছেলেবেলায় গরমের ছুটিতে মামার বাড়ি লালবাগে বেড়াতে গিয়ে ফেরার সময় এক ঝুড়ি খুব মিষ্টি আম নিয়ে এসেছিলেন। সেই আমেরই একটা আঁটি থেকে এই গাছ হয়েছিল। বেশ কয়েক বছর পরে যখন প্রথম ফল এল সেই আম পাকলে পরে খেয়ে সবারই সেই লালবাগের আমের কথা মনে পড়েছিল, যদিও এর আঁটিতে অল্প একটু টক ছিল আর লালবাগের আম ছিল নিখুঁত মধুর।

ওদিকে ওই একই আমগাছের নাম ছিল সরসীপিসিদের পশ্চিমবাড়িতে কলমি আমগাছ। এ গাছের কলমের চারা নাকি সরসীপিসির ঠাকুমা অনন্তকাল আগে ধামরাইয়ের রথের মেলা থেকে স্বহস্তে কিনে এনেছিলেন।

সবচেয়ে গোলমাল বাধিয়েছিল দুই বাড়ির সীমানার ঠিক ওপরে এই আমগাছটার অবস্থিতি। আমি এখনও ভেবে পাই না এই একটি টোকো আমগাছ নিয়ে দুটি পুরনো সংসারের বন্ধুত্ব বছর বছর ভেঙে যেত কী করে।

দুটি পুরনো সংসার। প্রায় একই চৌহদ্দির মধ্যে পাশাপাশি বাড়ি। একশো বছরেরও বেশি পাশাপাশি ছিলাম আমরা।

যদিও স্বজাতি নই, আমরা ব্রাহ্মণ, সরসীপিসিরা বৈদ্য, আমাদের দুই বাড়ির মধ্যে আত্মীয়তার অভাব ছিল না। সরসীপিসি, অতসীপিসি দুই বোনকেই দেখেছি ভাইফেঁটায় বাবাকে ফেঁটা দিতে। সরসীপিসি, অতসীপিসিদের যখন পাত্রপক্ষ দেখতে আসত, ওঁদের চুল বেঁধে দিতেন আমার মা সেকালের ফ্যাশনে, মাউন্ট করার স্টাইলে। ওঁরা মাকে বউদি বলতেন, বয়েসের ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও আমার মার ছোটখাটো রঙ্গতামাশা ছিল এই দুই বোনের সঙ্গে।

সরসীপিসিদের আমরা যে পিসি বলতাম, ওঁরা যে মাকে বলতেন বউদি এবং এবাড়ি ওবাড়ির সব সম্পর্কই যে এই ছকের অধীন ছিল তার কারণ অবশ্য আমাদের ঠাকুমা।

আমাদের ঠাকুমার বাপের বাড়ি মানে বাবার মামার বাড়ি ছিল যে গ্রামে সেই গ্রামেরই মেয়ে সরসীপিসির মা, ঠাকুমার চেয়ে বয়েসে বছর পনেরোর ছোটো। ঠাকুমা পালটি ঘর দেখে, সম্বন্ধ করে পাশের বাড়ির বউ করে এনেছিলেন গ্রামের মেয়েটিকে। কী যেন নাম ছিল সরসীপিসির জননী, ঠাকুমা ডাকতেন হরি বলে, রাগ করলে বলতেন, হরির বড় বড় হয়েছে। খুশি থাকলে বলতেন, হরির মতো মেয়ে হয় না।

হরি মানে, যতদূর মনে পড়ছে হরিদ্রাসুন্দরী, আমাদের নোয়াঠাকুমা। নোয়া মানে নিশ্চয় নতুন। গল্প লিখতে বসে অভিধান খুলব না, যা লিখছি তাই সত্যি। সরসীপিসির মা আমাদের ঠাকুমাকে দিদি বলতেন, সেই সূত্রে তিনি আমাদের নোয়াঠাকুমা বা নতুন ঠাকুমা।

এই সব মধুর সম্পর্ক, পাতানো আত্মীয়তা নষ্ট হয়ে যেত কালবোশেখির ঝড়ে। ঝড়ের বাতাসে যখন সীমানার আম গাছ থেকে আম ঝরে পড়ত দু বাড়ির উঠোনে, তুমুল হুলস্থূল পড়ে যেত দু বাড়িতে, দু পক্ষই দাবি করত সব আমই তাদের প্রাপ্য। কারণ গাছটা তাদের। একবার আমিন ডেকে জরিপ করে এ সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা হয়েছিল। তখন নাকি দেখা যায় দু বাড়ির মধ্যের সীমানা চলে গেছে সরাসরি আমগাছের বিশাল গুঁড়ির মধ্য দিয়ে। কিন্তু এতে সমস্যার সমাধান হয়নি।

যতদিন গাছে আম থাকত, জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ অবধি আম নিয়ে, আম পাড়া নিয়ে তুমুল বচসা চলত দু বাড়ির মধ্যে। কয়েক দশক ধরে এই গোলমাল চলেছিল। এই বচসা উত্তরাধিকার সূত্রে আমার ঠাকুমা পেয়েছিলেন তার শাশুড়ির কাছ থেকে, নোয়া ঠাকুমাও হয়তো তাই।

দু বাড়ির মধ্যে কথাবার্তা, মুখ দেখাদেখি পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যেত। টিনের বেড়ার অন্য প্রান্তে দু বাড়ির অন্দরমহলের মধ্যে যাতায়াতের একটা গেট ছিল। ঝগড়া চরমে উঠলে গেটটা পেরেক মেরে বন্ধ করে দেয়া হত।

তখন আমি সরসীপিসির কাছে প্রত্যেকদিন সন্ধ্যাবেলা যাই; সংস্কৃত অঙ্ক এই সব একটু দেখিয়ে নিই। আমি সরসীপিসি বলতাম বটে, দাদা কিন্তু তার সঙ্গে বয়সের সামান্য ব্যবধান মোটেই মান্য করত না। দাদা তাকে নাম ধরেই ডাকত। তবে আমার মতোই দাদারও সরসীপিসির বিদ্যাবত্তা সম্পর্কে কোনও সন্দেহ ছিল না।

দাদার নির্দেশেই আমি সরসীপিসিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কোনটা ঠিক, নস্য না নস্যি? সরসীপিসি যখন বললেন নস্যি নস্য একই শব্দ, পুংলিঙ্গ আর স্ত্রীলিঙ্গ, সেটা দাদাকে জানাতে দাদা বলল, সরসী বানিয়ে বাজে কথা বলছে। ডিকশনারি একবার দেখিস তো।

ডিকশনারি দেখে কিন্তু কোনও উপকার হল না। আমাদের একটা পুরনো পাতা ছেঁড়া ছাত্রবোধ অভিধান ছিল, হ্রস্ব ইর আগে এবং হয়ের পরে সব শব্দ সেই বইয়ের থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। ন অবশ্য মাঝামাঝি জায়গায় অক্ষত অবস্থাতেই ছিল। সেখানে পাওয়া গেল নস্য মানে নস্যি, নস্যি মানে নস্য। আমাদের বাসায় একটা বড় অভিধান অবশ্য ছিল। খুব সম্ভব সুবলচন্দ্র মিত্রের কিংবা জ্ঞানেন্দ্রমোহনের কিন্তু সেটা কাকার হেফাজতে। কাকা কলকাতায় থাকেন, যাওয়ার সময়ে ভাল করে বাঁধিয়ে কাঁচের আলমারিতে তালা দিয়ে রেখে গেছেন। ঠাকুরদার কাছারি ঘরের আইনের বইগুলোর মতো লাল চামড়া দিয়ে বাঁধানো গায়ে সোনালি অক্ষরে লেখা বাঙলা ভাষার অভিধান, এবং তার সঙ্গে কাকার নিজস্ব সংযোজন, বিনা অনুমতিতে ব্যবহার নিষেধ।

সুতরাং নস্য এবং নস্যির পার্থক্য জানা হল না। দাদার মনে একবার সন্দেহ হয়েছিল শব্দটা বোধহয় আরবি। হেড মৌলভি সাহেবকে গিয়ে এ বিষয়ে প্রশ্ন করায় তিনি দাদাকে ঠাস করে গালে একটা চড় কষিয়ে দিয়েছিলেন। অল্প কিছুদিন আগেই তিনি অপদস্থ হয়েছেন দাদাকে ছাত্র বানাতে গিয়ে, এখন এই নস্যি শব্দের উৎপত্তি সূচক প্রশ্নটি তার কাছে যথেষ্টই অবমাননাকর মনে হয়েছে। তা ছাড়া তিনি নিজে একজন নামকরা নস্যিখোর, সারাদিন দু আঙুলে নাকে নস্যি গুঁজে যান। তাঁর দাড়িতে, আলখাল্লার মতো লম্বা পিরানে নস্যির ছড়াছড়ি।

দাদা কিন্তু রাগ করল না, দুঃখ পেল না মৌলভি সাহেবের আচরণে, বরং এই এক চড়ে দাদা নিজে থেকেই নস্যি নেওয়া ছেড়ে দিল। আমাদের দালানের বারান্দায় পূব দিকে মুখ করে জোরে ছুঁড়ে ফেলে দিল সেই নস্যির কৌটো। দাদার নস্যির কৌটোটা ছিল একটু অন্যরকম, চৌকো আকারের গ্রামোফোন পিনের খালি কৌটো, যা ওপরে সেই ভুবন বিখ্যাত সংগীতপিপাসু কুকুর ও গ্রামোফোনের চোঙার ছবি। আগের গোল টিনের কৌটোটা সেদিন আবিষ্কার হওয়ার পরে বাজেয়াপ্ত হওয়ায় দাদা তারপর

থেকে এই কৌটোটা ব্যবহার শুরু করে, এটার সুবিধে এই যে এর বিসদৃশ আকারের জন্যে এটাকে নস্যির কৌটো বলে হঠাৎ সন্দেহ করা কঠিন।

দাদার মনে কী ছিল জানি না। ভর সন্ধ্যয় দালানের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাদা সজোরে কৌটোটা উঠানের ওপর দিয়ে ছুঁড়ে দিল। ওপারে জানলার ধারে তন্ময় হয়ে বসে সরসীপিসি লণ্ঠনের আলোয় লেখাপড়া করছিলেন। কী করে যে কী হল, সেই কৌটো কোনাকুনি জানলা দিয়ে ঢুকে লাগল সরসীপিসির ডানচোখের ঠিক ওপরে। তারপর একেবারে যাকে বলে রক্তারক্তি কাণ্ড। সরসীপিসির ডান ভুরু ওপরে কেটে গিয়েছিল। ঠিক কতটা কেটে গিয়েছিল বলা কঠিন, কারণ আমাদের বাড়ি থেকে কেউই সেটা দেখতে যায়নি বা খোঁজ নিতে যায়নি।

সেই সন্ধ্যায় হাত-পা ছুঁড়ে সরসীপিসির আত্ননাদ, সরসীপিসির হাত ছোঁড়ার ফলে টেবিল থেকে হ্যারিকেন লণ্ঠনটি পড়ে গিয়ে ভেঙে যাওয়া, কিঞ্চিৎ নিশ্চিন্ততা, তারপর হই হউগোল, চিৎকার চৈচামেচি, শুধু থানা-পুলিশ হয়নি।

তবে সেদিন আমরা টু শব্দটিও করিনি। করার উপায়ও ছিল না। শুধু ঠাকুমা গোপনে দাদাকে শহরেরই অন্য এক পাড়ায় ঠাকুমার এক দূর সম্পর্কে বোনের বাড়িতে চালান করে দিয়েছিলেন।

আম-পাকার মরশুম চলছে সেটা। এর আগে কয়েকদিন ধরেই দু বাড়িতে ওই লালবাগি তথা কমিগাছের আম নিয়ে অষ্টপ্রহর খিটিমিটি গালাগাল বাকবিতণ্ডা চলছিল। আজ দাদার নস্যির কৌটো ঘোঁড়ায় এবং তজ্জনিত সরসীপিসির আঘাতে ব্যাপারটা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছল।

পুরো গ্রীষ্মটা এই রকম গেল। ওই একই ধারাবাহিকতায়। তারপর একদিন গাছের শেষ আমটি ফুরোল।

এরই মধ্যে একদিন অম্বুবাচীর শেষদিন শেষ রাতে শহরবাসী হঠাৎ ঘুমঘোরে বিছানায় জেগে উঠে শুনতে পেল শৌঁ-শৌঁ, শৌঁ-শৌঁ শব্দ; সম্বৎসর যেমন হয়, যমুনার জল তোড়ের মুখে শহরের পাশের ছোট নদী ছাপিয়ে শহরের ভেতরের খালের মধ্যে ঢুকছে তারই উচ্ছ্বাস।

এক সপ্তাহের মধ্যে বেনোজল রাস্তাঘাট পুকুর সব একাকার করে দিয়ে শহরের ভেতরে ঢুকে পড়ল। আমাদের বাড়িগুলো ছিল ডাঙা জমিতে, নাবাল জমির উঠোন ডুবিয়ে প্রথমদিন সরসীপিসিদের উঠোনে তারপর দিন আমাদের উঠোনেও জল ঢুকে গেল। প্রথমে পায়ের পাতা ডোবা জল, তারপর আধ হাঁটু, হাঁটু শেষপর্যন্ত আধ কোমর জল। তবে জলের দেশের লোক আমরা, আমাদের ঘর-দালানোর ভিটে এত উঁচু করা হত যে কখনওই শোয়ার ঘরের মধ্যে জল ঢুকত না। গোয়ালঘর, ভাড়ারঘর, চৈকিঘর এসবের ভিটে উঁচু হত না, এসব ঘরে জল ঢুকে যেত।

সরসীপিসিদের একটা দুধের গাই আর বাছুর ছিল। আমাদেরও দুয়েকটা গোরু ছিল। গোয়ালঘরে জল ঢুকতেই আমাদের গোরুগুলোর সঙ্গে বিনা বাক্যব্যয়ে সরসীপিসিদের গাইবাছুর আমাদের বাইরের বারান্দায় স্থানান্তরিত হল।

সরসীপিসির বাবা দেলদুয়ারের গজনভিদের সদর সেরেস্তার নায়েব ছিলেন। তার এক প্রজা বর্ষার ফল এক ধামা অল্লমধুর নটকা দিয়েছিল, তার অর্ধেক আমাদের বাড়িতে এল। ইতিমধ্যে বর্ষার জলের তোড়ে দু বাড়ির ভেতরের দরজা আবার খুলে গেল।

সরসীপিসিদের রান্নাঘরের বারান্দায় অল্ল জল উঠেছিল। একদিন সন্ধ্যার দিকে নোয়াঠাকুমা সেই বারান্দা থেকে একটা বড় বেতের ধামা চাপা দিয়ে একটা বেশ বড়, অন্তত তিন চার সের কাতলা মাছ ধরে ফেললেন। বর্ষার জলে মিউনিসিপ্যালিটির পুকুর উপচিয়ে সব বড় বড় মাছ বেরিয়ে গিয়েছিল। এটা তারই একটা।

সেদিন রাতে আমাদের বারান্দায় রীতিমতো ফিস্টি হল। অনেকদিন পরে পেতলের ডুমলঠানটা মেজে ঘসে বারান্দায় টানায় ঝুলিয়ে দেওয়া হল। সারা সন্ধ্যা ধরে তার আলো দুলতে লাগল উঠোনের জলে। সামান্য আয়োজন; খিচুড়ি, দু চামচে করে খাঁটি গাওয়া ঘি আর কাতলামাছ ভাজা। স্পেশ্যাল আইটেম ছিল কাতলামাছের কাটার ঝাল-চচ্চড়ি। গাছকোমর করে শাড়ি বেঁধে সারা সন্ধ্যা বসে নিজের হাতে

তরকারি কুটে, মশলা বেটে সরসীপিসি সেই চচ্চড়ি রাঁধলেন, মাছের কাটার সঙ্গে কচুর লতি, মিষ্টি কুমড়া আর বরবটি দিয়ে। এখনও তার স্বাদ জিবে লেগে আছে।

সরসীপিসি যখন রান্না করছেন, কাঠের উনুনের গনগনে আঁচে তার মুখটা লাল হয়ে উঠেছিল, ঘামের বিন্দুতে ভরে গিয়েছিল। হঠাৎ দেখি ঠাকুমা একটা ভিজে গামছা নিয়ে মুখটা মুছিয়ে একটা লণ্ঠন তুলে মুখটা খুব ভাল করে নিরীক্ষণ করলেন। অবিবাহিতা কুমারী মেয়ে সেই যে নস্যির কৌটোর আঘাত লেগেছিল, কোথাও খুঁত হয়ে গেল নাকি?

এইভাবে দিন চলে গেল, মাস, বৎসর। এখন মনে হয় যেন যুগের পর যুগ।

দাদা একাই যে নস্যির কৌটো ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল তা নয়। অনেকেই নস্যি নেওয়া ছেড়ে দিল। সদর হাসপাতালের বড় ডাক্তার মেজর মফিজুল্লা সাহেব নিজেই নাকে নস্যি নিয়ে ক্যানসার হয়ে মারা গেলেন। নস্যির রমরমা চলে গেল। অনেকে টেক্সা বিড়ি খাওয়া আরম্ভ করলেন, নীল সুতো দিয়ে বাঁধা, ছোট ছোট কড়া বিড়ি। পয়সাওলা কেউ কেউ কঁচি সিগারেট ধরলেন।

নস্যির যুগ শেষ।

কিন্তু আমার গল্প এখনও একটু বাকি আছে। আমার ম্যাট্রিক পরীক্ষার সঙ্গে জড়িত ঘটনাটা।

আমাদের ওই ছোট শহরেও মেয়েদের একটা আলাদা কলেজ ছিল। সেই কাদম্বিনী গার্লস কলেজ থেকে সরসীপিসি সদ্য আই-এ পরীক্ষা দিয়েছে। অল্প কয়েকদিন পরেই আমার ম্যাট্রিক পরীক্ষা।

পরীক্ষার অল্পদিন আগে বুঝতে পারলাম পড়াশুনো যা হয়েছে ঠিক আছে, কিন্তু পরীক্ষার আগে একবার ভালভাবে ঝালাই করে নিতে না পারলে সুবিধে হবে না। তবে সে জন্যে এখন যা সময় আছে।

তাতে রাত জাগা দরকার। কিন্তু চিরকালই আমি খুব ঘুমকাতুরে, সন্ধে সাড়ে আটটা বাজতে না বাজতে আমার চোখ ঘুমে বুজে আসে।

সরসীপিসির কাছে গেলাম। এক নিমেষে এই সমস্যার সমাধান করে দিলেন দিনি। বললেন, তুই মন্টুদার দোকানে চলে যা, দু পয়সার নস্যি কিনে নিয়ে আয়। এক টিপ নস্যি নাকে দিলে সারারাত ঘুম আসবে না।

আমি কিঞ্চিৎ সন্দেহ ও সংস্কারাচ্ছন্ন চোখে তাকাতে সরসীপিসি বললেন, কোনও দোষ হবে না। আমিও তো বাবার ডিবে থেকে পরীক্ষার আগে নস্যি নিয়ে রাত জাগি।

আমি তখন একটা নতুন অসুবিধের কথা বললাম, নস্যি রাখার কৌটো তো আমার নেই। সরসীপিসি কী ভেবে একটু ঠোঁট টিপে হেসে বললেন, আমার কাছে একটা কৌটো আছে। সেটায় তোর হয়ে যাবে।

এই বলে সরসীপিসি তার পড়ার টেবিলের ড্রয়ার খুলে একটা কৌটো বার করে দিলেন। দাদার ছুঁড়ে মারা সেই গ্রামাফোন পিনের চৌকো কৌটোটা।

একটু পরে কৌটোটা নিয়ে কাছারির মোড়ে মন্টুদার দোকানে গেলাম নস্যি কিনতে। নস্যির তখন বেশি বিক্রিবাটা নেই। কৌটোর নীচে সামান্য তলানি পড়ে আছে। মন্টুদা বললেন, দু পয়সার নস্যি হবে না। তুমি এখন এটুকু দিয়ে কাজ চালাও। দুয়েকদিন পরে দোকানে নস্যি এলে পরে এসে। দু-পয়সার নস্যি নিয়ে যেও।

সেই চৌকো কৌটোয় নস্যটুকু পুরে বাড়ি চলে এলাম। কিন্তু নস্যি আমার নাকে দেওয়া হয়নি। হাতের তর্জনী আর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মধ্যে এক টিপনস্যি ধরে রাখলেই যথেষ্ট, এর চেয়ে বেশি আমার লাগে না। নাকে দেওয়ার দরকার নেই।

ওই তলানি নস্যটুকুতেই ম্যাট্রিক পরীক্ষা পার হয়ে গেল। মন্টুদার দোকান থেকে আর দু পয়সার নস্যি নিয়ে আসার দরকার হল না।

তারপর ম্যাট্রিক পাশ করে ছোট শহরের থেকে মহানগরে চলে এলাম। সেই চৌকো কৌটোর। তলায় সামান্য এক ফোঁটা ঝঝ চলে যাওয়া, বিবর্ণ হয়ে যাওয়া নস্যি। আজও কৌটোটা হাতে নিলেই আমার

হয়ে যায়। নাক পর্যন্ত নসি় পৌঁছনোর দরকার পড়ে না। ইন্টারমিডিয়েট, বি এ, এম এ, চাকরির।

পরীক্ষা ওই একই নসি় ভরসা করে পার হয়ে গেলাম।

তারও পরে তিরিশ চল্লিশ বছর হয়ে গেল। নসি়র কৌটোটা কিন্তু এখনও হারায়নি। একটু চেষ্টা করলেই দেরাজে না আলমারিতে খুঁজে পাব। পুরনো, দোমড়ানো কৌটোর গায়ে অস্পষ্ট হয়ে আসা কবেকার কুকুর আর চোঙার ছবি।

****সমাপ্ত****